দৈনিক সংবাদ

78

তারিখ ... 01 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# গণসাক্ষরতা

এবার ফেব্রুয়ারি মাসে গণসাক্ষরতা বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে সামনে উঠে এসেছিল। মহৎ কাজ, ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও মর্মবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান নিরক্ষরের দেশে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রহসনের মতো মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আবালবৃদ্ধবণিতাকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে সরকারের তরফ থেকেও গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কোন মহাপরিকল্পনার কথা আমরা শুনতে পাইনি।

আমরা যত দূর জানি, ২০০০ সালের মধ্যে 'শিক্ষিতের হার' ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রধান বাহন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী যদি ঠিকমত বাস্তবায়িত হয় তবে বয়স্কের মধ্যে নিরক্ষরতা যে বাড়বে না তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। তবে তাতে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার কোন গতি হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগটি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। মাঝে মাঝেই এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিশদ আলোচনা করা হয়। অতীতের গণশিক্ষা কর্মসূচীর তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে রেখেই হয়ত এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় না। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার কাজটি যে কত কঠিন তা অতীত অভিজ্ঞতাই বলে দেবে।

বেসরকারী সংস্থা 'সম্মিলিত সাক্ষরতা অভিযানের' সমন্বয়কারী ডক্টর আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, সরকারী হিসেব অনুযায়ী দেশের ১৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ৬৭ শতাংশ নিরক্ষর। সরকারের বর্তমান কর্মসূচী অনুযায়ী সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করা হলে বাংলাদেশের সব মানুষকে সাক্ষর করতে ১৪ বছর সময় লাগবে। ডক্টর শরফুদ্দিন বলছেন, সকল মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হলে একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই ধরনের আন্দোলন কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব সরকারের তরফ থেকে তার দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয়ভিত্তিক গণশিক্ষা কর্মসূচী সূচনা করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সরকার বদল হলে এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে এর মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, কর্মসূচীটি ছিল উচ্চাভিলাষী। কর্মসূচীর প্রতি সরকারের আন্তরিকতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার ছিল না। কর্মসূচীর সূচনার আগে পর্যাপ্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না। 'সাক্ষরতা দানের' মান ছিল নিচু। ১৯৮৭ সালে এই কর্মসূচী পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তাতে একমাত্র নতুন দিক ছিল এনজিওদের সম্পৃক্ত করা। বর্তমান সরকারের আমলেও রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে গণশিক্ষা বা গণসাক্ষরতা অভিযান চালানোর কোন ব্যাপক কর্মসূচী আছে বলে আমাদের জানা নেই। নিরক্ষতা দূর করার মত কঠিন কাজে বিদেশী দান-অনুদাননির্ভর 'এনজিও'গুলো সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আসল কাজটি সরকারকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের আরও তৎপর হওয়া দরকার।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সহযোগী কর্মসূচী হিসেবে গণসাক্ষরতা কর্মসূচী গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যদি ঠিকমত নির্মাণ করা হয় এবং সেগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা হয় তবে এগুলোতেই আনুষঙ্গিক কর্মসূচী হিসেবে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে। এগুলোর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের সম্পৃক্ত করা হলে দেখাশোনা ও নজর রাখার কাজটি অনেক সহজ হবে। বয়স্কদের সাক্ষরতা দানের জন্য অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ব্যাপারে এনজিওদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতা কি করে ধরে রাখা যায় সে ব্যাপারেও আগে-ভাগে চিন্তাভাবনা করা দরকার। তা না হলে সাক্ষরতাদানের কাজটি পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।